প্লুটো

কমল সাহা

গভীর জলের ভেতর ফুঁড়ে বের হয়ে উঠল শঙ্খদীপের আত্মাটা। মৃত্যুটা স্পষ্ট বুঝে গেল সে। আরও বুঝল, দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলে, আত্মা অনেক ভাবলেশহীন হয়ে যায়। সদ্য মৃত্যুর কোনও হাহাকার নেই। নেই দোষারোপ, ক্রোধ, অতি আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনও কিছু। আত্মা আক্ষরিক অর্থেই সদা শুচি। নির্মোহ। দায়হীন।

তবুও দু-এক ধোয়ায় না ওঠা দাগের মতো অল্প - স্বল্প দায়বদ্ধতা থেকেই যায় বাবা মা, আত্মীয় পরিজনদের জন্য। তাই শঙ্খদীপ হালকা এক ধরনের দুঃখ অনুভব করছিল, পরবর্তী পরিস্থিতির কথা ভেবে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের কান্না, হা-হুতাশ, বিমূঢ় বাবার অবর্ণনীয় কষ্ট। লাশকাটা ঘর, সুরতহাল, শ্মশান, শ্রাদ্ধ-এত সব মেনে নিতে ভাল লাগছিল না তার।

তাই সে ভাবছিল : দেহটা অল্প দূর ভাসলেই সুটুঙ্গা থেকে মানসাইয়ে যাবে। আর মানসাইয়ে গেলেই পেয়ে যাবে অনেক বেশি স্রোত। পারে কিংবা অন্য কিছুর সঙ্গে ঠেকে যাওয়ার মতো অঘটন যদি না ঘটে, সারাটা রাত যদি নিরবচ্ছিন্ন একটানা ভাসতে থাকে, তবে সকালের মধ্যে বাংলাদেশে দেহটা ভেসে চলে যেতেও পারে। বাংলাদেশে একবার ঢুকে গেলে, আর কোড়্যা হ্যাপা থাকবে না। সবাই ভাববে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে শঙ্খদীপ। বিস্তর আলোচনা হবে, অনেক খোঁজাখুঁজি হবে। সংবাদপত্র, টিভিতে নিরুদ্দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তারপর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাবে সব খোঁজাখুঁজি। কেবল মা-বাবা ফিরে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুনবে। আজীবন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে - যেখানেই থাকি যেন ভাল থাকি।

কিন্তু দেহটা কোথায় গেল? এখনও তো ভেসে উঠল না! নাকি ভেসে উঠছে? ভেসে উঠে অলক্ষ্যেই ভেসে চলে যাচ্ছে স্রোতের স্বপক্ষে! —ভাবল শঙ্খদীপ।

শঙ্খদীপ ভালই বোঝে, এতটা দূর কোনও মতেই দেহটার চলে আসা সম্ভব নয়। তবুও অনেকটা এলাকা জুড়ে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে সে। নদীর উপরে এলোপাতাড়ি রেখার আঙ্গিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনও ক্ষিপ্ত কখনও আবার ধীর গতিতে। কয়েক মিনিট কেটে গেলেই কয়েকশ' মিটার বেশি করে নজরদারির আয়তন বাড়িয়ে নিচ্ছে।

এ যেন কে লুকোচুরি খেলা। মৃতদেহের সঙ্গে আত্মার।

খোঁজাখুঁজি চলতে চলতেই হঠাৎ দার্শনিকতায় পেয়ে বসল শঙ্খদীপকে। ভাবল:ভ্রহ্মাণ্ডও ক্রমশ তার আয়তন বাড়িয়ে নিচ্ছে। এই আয়তন বাড়িয়ে নেওয়ার মূলেও কি তাহলে কোনও কিছুর খোঁজ? নিহিত আছে কোনও অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা?

ব্রহ্মাকাণ্ডের আয়তন বাড়ার কথা আজই প্রথম শুনেছিল শঙ্খদীপ। ছুট কাটাতে আসা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদীপ্ত রায়ের কাছে। সুদীপ্ত মাথাভাঙ্গারই ছেলে। সেই সুবাদে খুব ছোটবেলা থেকে শঙ্খদীপ সুদীপ্তকে চেনে। নিচু ক্লাসে থাকাকালীন বছর দু-এক প্রাইভেটেও পড়েছিল সুদীপ্তর কাছে। আর তখন থেকেই তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল শঙ্খদীপ। তার ভাষা চাতুর্য, বোঝানোর অসাধারণ ক্ষমতায় বিহ্বল হয়ে যেত। মনে মনে ভাবত, স্কুলে মাস্টারমশাইরা যদি সুদীপ্তদার মতো হত, তাহলে কী ভালই না হত। যাদের প্রাইভেট পড়ার সামর্থ নেই, সেই সব গরীব ছাত্ররা কী যে উপকৃত হত! সবাই কত অনায়াসে পাশ করে যেত!

উচ্চশিক্ষার জন্য একসময় সুদীপ্তকে দিল্লি চলে যেতে হল। কিন্তু সে যখনই আসত, খবর যেত শঙ্খদীপের কাছে। যে খবরে শঙ্খদীপ উৎসবের আমোদ পেত।

সুদীপ্তদা আসা মানেই কাঙ্ক্ষিত সব আলোচনা। কেবলই গ্রহ-নক্ষত্র, অণু-গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকাদের নিয়ে দীর্ঘ চর্চা। এক সৌর জগৎ থেকে অন্য সৌর জগতে পৌঁছে যাওয়া। যার কোনও শেষ নেই। অসীম কল্পনাও যাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু অমোঘ বাস্তব।

আলোচনা চলছিল প্লুটো নিয়ে। এমন সময় মিসড কল এল শিল্পার। 'একসকিউজ মি' বলে শঙ্খদীপ লম্বা বারান্দার এক কোনো গিয়ে রিংব্যাক করল। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল-

শোন, মা-বাবা আর ভাই এইমাত্র দিনহাটা গেল। আমার এক দাদার বৌভাত অ্যাটেন্ড করতে। তোমার জন্য আমি গেলাম না। ওরা কাল সকালে ফিরবে। তুমি আধঘন্টার মধ্যে চলে এসো। বাইক নিয়ে এসো না কিন্তু । রাতে একসঙ্গে থাকব। আর, তোমার জন্য রান্না করছি। আজ একদম অন্যভাবে একসঙ্গে খাব। আর শোন, কন্ডোম এনো। ছাড়ি।

যারপরনাই পুলকিত হল শঙ্খদীপ। সাট করে মগজ থেকে প্লুটো বিদায় নিল। পরিবর্তে আগমন ঘটল আকুল শিল্পার অনুপম নগ্ন শরীর। অনেক দিন যার নৈকট্য থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল তাকে।

—সুদীপ্তদা, একটা জরুরি কাজ পড়ে গেল। কাল ঠিক আজকের টাইমে আসব। কোথাও চলে যেও না কিন্তু। অনুনয়ের সুরে বলল শঙ্খদীপ।

গ্যারেজে বাইক রেখে বগলে ডিওডোরেন্ট স্পে করতে করতে মাকে বলল : 'মা, রাতে খাব না। ফিরতেও প্রায়

ভোর হয়ে যাবে। বক্সিরহাট থেকে শালের লরি আসবে সুজলদের। একটু থাকতে হবে। দু-তিন হাজার টাকা পাওয়া যাবে।'

একমাত্র টাকার লোভ দেখতে পারা গেলে শঙ্খর মা কোনও উচ্চবাচ্য করে না। কোনরকম জেরা টেরাও করে না। কেমন যেন একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। চোখ দুটো চকচক করতে থাকে। 'সাবধানে থাকিস' বলেই তিনবার দুগ্গা দুগ্গা বলে।

আজও তাই হয়েছিল।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিল শঙ্খদীপ। মোবাইল বেজে উঠল। শিল্পা। 'শোন, আচ্ছা বিপদে পড়া গেল। যোশীতা বলছিল, ও নাকি রাতে আমার সঙ্গে থাকবে। আমি ভেবেছি ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে যাব। এগারটা পর্যন্ত আমরা ভেল্লী গাছটার ওখানে কাটাব। তারপর ঘরে ঢুকব। একবার এসে তালা দেওয়া দেখলে পরে ও আর আসবে না। তুমি এখনই চলে আসো। যেখানে আমরা বসি সেখানে। তুমি এলে আমিও যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি আসো।'

শঙ্খদীপ কিছুক্ষণ বাদেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌঁছে গেল। রিকশা থেকে নেমে রিকশার মুখ ঘোরানোর সময়টুকুর মধ্যে ডান-বাঁ দেখে নিল কোনও মানুষ আছে কিনা। তারপর তরতর করে বাঁধ থেকে নিচে নেমে গেল। ভেল্লী গাছের গোড়ায়।

জায়গাটা খুবই জটিল এবং নিরাপদ। গাছ কীভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করে, শঙ্খদীপের কাছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই ভেল্লী গাছটি। অনেক দিন যাবৎ শিকড় আগলে রেখেছে দৈর্ঘ-প্রস্থে পাঁচ-ছ' ফুট মাটি। তারপর সটান খাদ। যে খাদের উপরিভগে বের হয়ে আসছে বিক্ষিপ্ত শিকড়ের ছুঁচলো মুখেরা। পরবর্তী ভাগ ছুঁয়ে আছে জলের গভীরতা।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা এই জায়গাটিই শঙ্খ আর শিল্পার অভিসারের ঠিকানা। বাড়ির এত কাছাকাছি অথচ অসম্ভব নিরাপদ। যেখানে বসলে অনায়াসে অন্যের আড়াল হওয়া চলে, কিন্তু বাঁধের ওপর দিয়ে মানুষের যাতায়াত লক্ষ্য করা যায়।

অন্ধকারে একা এক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল শঙ্খদীপ। একসময় বাঁধ থেকে কারও নেমে আসার শব্দ পেয়ে উৎসাহিতও হল। কাছে যে এল সে যে অন্য কে তা বুঝে উঠতে না উঠতে সজোরে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল শঙ্খদীপকে। কে এভাবে ধাক্কা দিল তা দেখেনি, কিন্তু বুঝেছে। কেননা জলে পড়ার আগমুহূর্তে যে পারফিউমের গন্ধটা তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পেরেছিল তা ওর চেনা।—

ঠিক সাত দিন আগে সুপ্রিয়র কাছ থেকে এই আশ্চর্য অনুভূতি জাগানো গন্ধটির সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। সুপ্রিয়কে বেধড়ক পেটানোর মনস্ত করেই সেদিন শঙ্খদীপ বাইক নিয়ে ধাওয়া করে তার স্করপিও গাড়িটি দাঁড় করাতে বাধ্য করেছিল। শুনশান রাস্তায় গাড়ির ভেতর থেকে টেনে নামিয়েও ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় আবেশে আপ্লুত করা গন্ধটা ওর ক্রোধ এবং হিংসার স্তরকে এতটাই নিচে নামিয়েও এনেছিল যে শেষ অবধি হাত তোলা আর হয়নি। শুধু কড়া একটা থ্রেট দিয়েছিল। শঙ্খদীপ বলেছিল : 'যদি শিল্পার দিকে হাত বাড়াস, কোনও দিন যদি শুনি শিল্পার সঙ্গে কথা বলেছিস, তাহলে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেব।'

বেশ কয়েক দিন যাবৎ শঙ্খদীপ শুনে আসছিল, সুপ্রিয়র সঙ্গে শিল্পার নিবিড় মেলামেশার কথা। এ ব্যাপারে শিল্পাকে জিজ্ঞেসও করেছে শঙ্খদীপ। কিন্তু প্রতিবারই শুধু নারীর সহজাত অভিনয় ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে নাটকীয় অস্বীকার করে গেছে সে। কপট কান্না আর জড়িয়ে ধারা ভালবাসায় বারংবার দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলেছে শঙ্খদীপকে। সহজেই বিশ্বাসের জায়গাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থও হয়েছে শিল্পার। কিন্তু অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে থাকা অবিশ্বাসের কয়েক কণাই সত্য উদ্‌ঘাটনের পথ প্রশস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

এক দিন হঠাৎ ভর দুপুরে শিল্পার বাড়ি গিয়ে প্রথমেই তার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করল শঙ্খদীপ। দেখতে শুরু করল মেসেজেস। ক্রিয়েট মেসেজ, ইনবক্স। দেখল কল রেজিস্টারে মিসড কল, রিসিভড কল, ডায়ালড নাম্বার, টাইম অব কল। সব কিছুতেই সুপ্রিয়র ব্যাপার উপস্থিতি। মেসেজগুলো পড়ে, কথা বলার গভীর রাতের সময়সূচি দেখে ভয়ানক রেগে গেল শঙ্খদীপ। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল শিল্পা। সজোরে গলা টিপে ধরা সত্ত্বেও কোনও রকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না সে। যেন মৃত্যুকে মেনে নিয়ে নিজেকে নিরুপায় সমর্পণ করল শঙ্খদীপের কাছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে লাল হয়ে উঠল। মুখ দিয়ে ফেনায়িত লালা বের হতে লাগল। তবুও নিজেকে রক্ষা করার সামান্যতম চেষ্টাও করল না। শিল্পা। বরং শঙ্খদীপেরই হাত দুটো অসাড় হয়ে গেল একসময়। গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল শঙ্খ। সে কান্না কিছুতে আর থামতেই চায় না। কাঁদছিল শিল্পাও।

বেশ কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হল শঙ্খদীপ। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই শিল্পা হাত টেনে ধরল শঙ্খদীপের। চোখ মুছে নিয়ে মুখে দৃঢ়তার ভাব এনে বলল : 'তুমি যা ভাবছ, আদৌ সে সব কিছু নয়। সত্যি করে বলছি। বিশ্বাস করোত আমি সুরিয়কে নাচাচ্ছি। আমাকে তার জন্য খারাপ মেয়ে ভারতে পার। কিন্তু সব মেয়েই ছেলেদের নামিয়ে নামিয়ে একটা মজা পায়।'

আবার কেঁদে উঠল শিল্পা। বলল: 'আমি তোমাকে ছাড়া ছাড়া কাউকে চাই না। ভাবতেই পারি না অন্য কারও

কথা। আর তুমি আমাকে মিছিমিছি কেবল সন্দেহ করো! আমাকে কষ্ট দাও, নিজেও কষ্ট পাও।'

শিল্পা সমস্ত সামর্থ নিঃশেষ করে জড়িয়ে ধরল শঙ্খদীপকে!

শঙ্খদীপ কিছু সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। তারপর ক্রমশ শরীরী উষ্ণতা, ঘ্রাণ ও কান্নার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তির উপায় খুঁজতে চাইল। ডিভ ও ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে আরম্ভ করল চোখের জল। রক্তিম গ্রীবায় আলতো চুমো দিয়ে প্রায়শ্চিত্য জানাতে লাগল। একসময় উভয়ে উভয়ের বসন খুলে দিয়ে আদিম আশ্লেষে লীন হতে শুরু করল।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের আশু কাজটা সাময়িক ভুলে যেতে বসেছিল শঙ্খদীপ। ওর অজান্তেই ভেসে বেড়অারে গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পেতেই আবার চনমনে হয়ে ভাসতে শুরু করল সে। একনিষ্ঠতার সঙ্গে খুঁজতে লাগল দেহটাকে।

হঠাৎ মানসাই-সুটুঙ্গার সঙ্গমস্থলের কয়েক মিটার আগে কালো রংয়ের কিছু একটা ভেসে যাওয়া লক্ষ্য করল শঙ্খদীপ। কাছে যেতেই আবিষ্কার হল ওটা ওরই দেহ। বেগুনাভ লাল রঙের গেঞ্জিটা সুটুঙ্গার ঘোলা জলে ভিজে আর আবছা আলোর কারণে কালো দেখাচ্ছিল। উপুড় হয়ে ভেসে চলছিল দেহটা। নিজের দেহটার সন্ধান পাওয়ায় পুলকিত হল শঙ্খদীপ। উল্লাসে চিৎকারও করে উঠল। কিন্তু সে চিৎকার অন্য কেউ শুনতে পাবে না। এমনকী নিজেও না। শুধু অনভূত হয়।

শঙ্খদীপ একদা তার মুথার চুলের খাঁজে আত্মাকে স্থাপন করে দেহের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলল। ক্ষণিক-বাদেই দেহটা সঙ্গমস্থল অতিক্রম করে মানসাইয়ের খরস্রোতে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎই ক্রমশ ডানদিকে ঘেঁষে যেতে শুরু করল। যা মোটেই অভিপ্রেত ছিল না তার। ডানদিক ঘেঁষে যাওয়া মানেই চলে আটকে যাওয়া সমূহ সম্ভাবনা। কান্না পেল ওর। কিছুক্ষণ আগের অনির্বচনীয় আনন্দটা অসহায়তার কাছে যেন নিমজ্জিত হতে লাগল।

না। শঙ্খদীপ এবার টের পেতে শুরু করল দুরন্ত জলপ্রবাহের, আলোড়নের, ঘূর্ণির ভেতর অসংখ্য ছোট ঘূর্ণি যা ওর দেহটাকে ডুবিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ঘোরাতে ঘোরাতে নিমেষে যেখানে নিয়ে গেল সেটা মধ্যনদী। যা ছিল ওর একান্ত কাম্য। স্বস্তিতে অভিষিক্ত হল শঙ্খদীপ। এবার আর ভাবনা নেই। এবার হয়ত নিরঙ্কুশ ভেসে চলা। কিছু দূর মনসাই। তারপর নাম পালটে সিঙ্গিমারি। তারপর নদীসীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের জলঢাকা। জলঢাকা মিশেছে তিস্তায় মিশেছে ব্রহ্মপুত্রে।

বিস্তীর্ণ চরটির দিকে বিদায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শঙ্খদীপ। যেখানে কাশতৃণরা হাওয়ায় দুলছে। যারা পেটের ভিতর হাতির দাঁতের রং, কুঁড়ি ধারণ করে রীতিমতো পূর্ণ গর্ভবতী যে কুঁড়িরা অস্থির হয়ে উঠছে ফুল হওয়ার জন্য।

এই চরটি শঙ্খদীপের আত্মীয় ছিল। মাঝেমধ্যেই আত্মিক টানে না এসে উপায় থাকত না। অবশ্য সারাটা বছর ধরে নয়। কেবলমাত্র শরৎকালে। পূর্ণিমার রাতে। কৃষ্ণপক্ষে বিকেল বেলায়।

বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে চোখ নিবিষ্ট করে রাখত দূরপ্রসারী অর্ধবৃত্তাকার কাশবনে দিকে। বিকেলের রোদের কণা কাশফুলের উপর পড়লে ওর মনও হেসে লুটোপুটি খেত তীব্র রুপোলি সাদা ফুলেদের সাথে সাথে। ভুলে যেত প্রতিদিনের একটু একটু করে জমে ওঠা ক্লেদ ও গরল। অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ। রাতে চাঁদের আলো যখন সমগ্র কাশবনকে সোহাগে লিপ্ত হয়, তখন শঙ্খদীপের ভিতরে এক আশ্চর্য অনুভূতি সক্রিয় হত। ভাবত : এই আলো, সেই সারা দিনের পর শ্রান্ত এক আলো, যে দু দণ্ড শান্তির জন্যই আশ্রয় নিতে আসে পৃথিবীর যা কিছু শ্বেতবর্ণের কাছে।

চর প্রায় শেষ হয়ে এলে, শঙ্খদীপ মনে মনে বিদায় জানাল উদ্ভিন্ন কাশবনকে। এবার সোজা তাকাল সে সামনেই পঞ্চানন সেতু তার কিছুটা পরই তেকোনিয়া ফরেস্ট। যকে ও আতমকা সুন্দীর ফরেস্ট নাম দিয়েছিল। ব্রিজের ওপর থেকে এই ফরেস্টটা খুব ঘন ও সুন্দর মনে হত। কিন্তু সামনে গেলেই ধু ধু মাঠ। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সেগুন, শিশু, শিমুলের গুঁড়ি।

প্রায় দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তেকোনিয়া ফরেস্টও। এবার ডানদিকে বাঁক নিল নদী। শঙ্খদীপরাও।

এই এলাকাটা অচেনা শঙ্খদীপের কাছে। ডাইনে-বাঁয়ে শুধু আবাদি জমি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোর টিমটিম আলো। কোনও রকমে টের পাওয়া যায়। মধ্য নদী বরাবর ভেসে চলছে দেহ। নিশ্চিন্তে ভেসে যেতে পারার জন্য স্বাভাবিক কারণেই স্মৃতির জগতে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে সমর্থ হল সে।